ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 601-609
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.048

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের আলোকে তৎকালীন বাঙালি সমাজচিত্র

বকুল সাহা, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জলঙ্গী মহাবিদ্যালয়, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bibhutibhushan Mukhopadhyay emerged in the middle of the 20th century. He was born in Pandul in Dwarbhanga district of Bihar. Although he was born in Bihar, his ancestors lived In Chatra region of Srirampur, Bangladesh. So he had to stay in Shivpur, Chatra and other areas of Bangladesh for his studies during his childhood and adolescence. He was able to establish contact with the rugged environment of Bihar and the Crop green desert of Bangladesh. Therefore, he got the opportunity to observe the social environment of Bihar and Bangladesh very well. He was the live-witness of the anti-British movement in pre-independence India, the Second World War and the great Bengal Famine of 1943. Also, he observed the effect of World War II and Bengal Famine on the society of Bihar and Bangladesh very closely.As a socially conscious writer, he was able to portray this social context in his short stories in a realistic manner. Although he was a humorous writer but his social studies beautifully Placed in the short stories behind the humours. As a writer, he has also protested by pen for Bengalis, who lost their homes and became completely destitute refugees due to the partition of India in 1947. In his short stories, perfectly described the Riot of Hindu and Muslim, along with the caste system and British flunkey bengalis. In short, the short stories of Bibhutibhushan Mukhopadhyay become a living document of the Bengali social environment of the middle of the 20th century.

Keywords: Bibhutibhushan Mukhopadhyay, Consciousness, Pre-independence society, Humorous writer, Bengal Famine, Partition of India.

সাহিত্য সমাজের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমকালীন সমাজকে উপেক্ষা করে কোন সাহিত্যিকই তার রচনাকে রূপ দিতে পারেন না। সমাজের প্রসঙ্গ সমকালীন জীবনের জীবন্ত বাস্তব রূপ তাদের রচনার মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই জায়গা করে নেয়। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেও ছিল এই সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি।বিভূতিভূষণ যে পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছেন যে মানুষজনের সাহচর্যে তিনি জীবনের বেশিরভাগ সময় গুলো কাটিয়েছেন, যে পারিবারিক জীবনের পরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে,

কিংবা তাঁর সমসাময়িক সমাজ তথা জাতীয় জীবনে ঘনিয়ে আসা রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক কার্যাবলি সমাজ তথা মানুষের জীবনে যে উত্থান পতন ঘটিয়েছে সেই সমস্ত কিছুকে তিনি তাঁর কথাসাহিত্যের বিষয় করে তুলেছেন। লেখকের চারপাশকে বেষ্টন করে থাকা সামাজিক জীবনের ঘটনাবলি এবং একান্ত পরিচিত পারিবারিক সামাজিক মানুষজনকে নিয়েই তাঁর কথাসাহিত্যের কাঠামো তথা বিষয়কে নির্মাণ করেছেন। তাঁর শৈশব কৈশোর যে মানুষগুলির সঙ্গে অতিবাহিত হয়েছে, পরিবার-স্কুল-কলেজ খেলার মাঠে যে সমাজকে মানুষজনকে তিনি দেখেছেন, যে সমাজ পরিবেশের সাথে তিনি জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করেছেন সেই সমস্ত কিছু তার কথাসাহিত্যের মধ্যে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে চিত্রণ করেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এর আবির্ভাব হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। জীবিকা অর্জনের তাগিদে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত সমস্ত কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে পুরোপুরি ভাবে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। যে সময় পর্বে তিনি সাহিত্য সাধনা শুরু করলেন তখন সমগ্র ভারতবর্ষ এক উত্তাল সময় পর্বের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল । দীর্ঘকাল ব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একেবারে শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল দেশ; তাই সমগ্র সমাজ জুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে, এই রাজনৈতিক উত্তেজনা সমগ্র সমাজ তথা সমাজের মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সামাজিক জীবনধারা, ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। বিভূতিভূষণ সেই সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই সময় একদিকে ছিল বিয়াল্লিশের অগাস্ট আন্দোলন, ১৯৪৩ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে,এমবিধ্বস্ত গ্রাম বাংলার মানুষের অসহায় করুন আর্তনাদের চিত্র, ১৯৪৬ এর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ এবং সেই স্বাধীনতার পথ বেয়েই দেশভাগের মতো এক বেদনাবাহী পরিবেশের সাক্ষী হয়েছিলেন লেখক। একজন সমাজ সচেতন শিল্পী হিসাবে এই সময় পর্ব কে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন লেখক। তিনি দেখেছিলেন গ্রামবাংলার অসংখ্য মানুষের এই দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অনাহারে মৃত্যুবরণের ছবি।দুমুঠো অন্নের জন্য মানুষের হাহাকারের চিত্র। সমগ্র বাংলাদেশের বুকে নেমে আসা শ্মশান এর শূন্যতা।সেই সঙ্গে স্বাধীনতার পথ বেয়ে আসা দেশভাগের ফলে অসংখ্য বাস্তুহারা মানুষের ঘরবাড়ি, জমি-জায়গা ছেড়ে, উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়ানোর চিত্র। আত্মীয় পরিজন হারিয়ে তাদের দুর্দশার এক জীবন্ত বাস্তব রূপকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই সমাজ প্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে তিনি তার সাহিত্যকে রূপ দিতে পারেননি। তাঁর ছোটোগল্পে এই সমস্ত সামাজিক বিষয়ের অত্যন্ত নিপূণ বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে এসেও সমাজে যে কুসংস্কার, আদিম বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সমাজ যে কতটা অনগ্রসর থেকে গেছে, সেই সমাজের অভ্যন্তরের বিশ্লেষণও তার সমাজবীক্ষার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে সরোজ দত্ত তাঁর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 'জীবন ও সাহিত্য সাধনা' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন- "তাঁর চোখে ধরা দেয় এমন এক সমাজের রূপ, প্রগতিশীল চলনের আড়ম্বরের নামে যা অসহায় ভাবে আঁকড়ে রেখেছে তার স্থানুত্বকে। এমনকি স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও অনড় স্থবিরত্ব থেকে সে মুক্তি পায় নি।"[১] সেখানে সমাজে পনপ্রথার নিষ্ঠুর কবলে পড়ে অসহায় মেয়ের করুন আত্মত্যাগের ঘটনা যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি মদমত্ত জমিজমিদারের মূঢ় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছবিও রয়েছে। সেই সঙ্গে সমাজে নারী-সমাজের মধ্যে অন্ধ-বিশ্বাস যে কতখানি বাসা বেঁধে আছে তার পরিচয় রেখেছেন লেখক; আবার সমাজে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বিংশ শতাব্দীতে এসেও

কতখানি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে বিরাজিত তারও অত্যন্ত নিপুণ বাস্তবসম্মত চিত্র অঙ্কন করেছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পের মধ্যে।

তাই একদিকে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে সমাজের ভগ্নরূপ অন্যদিকে কুসংস্কারগ্রস্ত সমাজের স্থবিরতার পরিচয় এই সবই তার গল্পের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর 'বীরুর প্রশ্ন' 'স্বাধীনতা ডিনার', 'স্বরাজ ছেলে', প্রভৃতি গল্পে সমকালীন পঞ্চাশের মন্বন্তর তার ফলশ্রুতিতে সমগ্র বাংলা জুড়ে চরম অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব প্রভৃতির চিত্র যেমন আছে তেমনি সাতচল্লিশ এ ভারতের স্বাধীনতা লাভ যে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রকৃতই স্বাধীনতা বয়ে আনতে পারেনি তার পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেই সঙ্গে 'কলকাতা নোয়াখালী বিহার' শীর্ষক গল্পগ্রন্থের তিনটি গল্প 'বিশ্বাস', 'প্রায়শ্চিত্ত', এবং 'সত্যাগ্রহী' নামক গল্পগুলির মধ্যে দেশভাগ সমগ্র বাংলা বিহার নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল তার পরিচয় আছে। এই দাঙ্গার বলি হয়েছিল হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য নিরীহ মানুষ। মানুষে মানুষে বিশ্বাস, দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বন্ধুভাবে বসবাস করা মানুষের পারস্পরিক প্রীতি, ভালোবাসা, সৌহাদ্যের সম্পর্ক, মানবিক মূল্যবোধ সমস্ত কিছু ভেঙে গিয়ে পরস্পর পাশবিক হিংস্রতায় মেতে উঠেছিল। সমাজের সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিচয় উঠে এসেছে এই গল্পগুলির মধ্যে। আবার 'কুইন অ্যান', 'দ্রব্যগুণ', 'ভারত উদ্ধার ও পাঁঠা' প্রভৃতি গল্পেও সমকালীন সমাজের রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সমস্ত বাংলা জুড়ে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের সৃষ্টি হয়েছিল তা সমগ্র বাংলাদেশে নিদারুণ বস্ত্রাভাব এর সৃষ্টি করেছিল তারই মধ্যে একজন কালোবাজারি, মজুতদার শ্রেণীর মানুষের অতিরিক্ত বস্ত্র মজুত করে রাখার পরিচয় পাওয়া যায় তার 'দুঃশাসন' গল্পটির মধ্যে। ট্রেনের মধ্যে এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক স্ত্রী সাজে সজ্জিত করে বেশ কয়েকজন সঙ্গিনীকে নিয়ে ওঠেন। হিন্দুস্তান থেকে পাকিস্তানের আমনোড়া যাচ্ছেন বলে পরিচয় দেন। রাধাকান্ত আচার্য নামে একজন পুলিশ ছদ্মবেশে ট্রেনে উঠে মাড়োয়ারি ভদ্রলোককে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে শেষপর্যন্ত আসল পরিচয়টি উদ্ঘাটন করে নেন। তল্লাশি করে দেখতে পান সঙ্গিনী বলে পরিচয় দেওয়া স্ত্রী সাজে সজ্জিত, তারা আসলে কেউই নারী নয়, সকলেই পুরুষ এবং এক অদ্ভুত দৃশ্য সামনে এসে পড়ে- "এক একজনের গায়ে দশখানা বারোখানা করিয়া ধুতি,শাড়ি, জামার কাপড়। এ ধরনের ভেলকি জীবনে দেখি নাই, একে একে একবস্ত্রে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, শুকাইয়া একেবারে চুপসাইয়া গেছে যেন কতদিনের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী"[২]আপাত হাস্যরসের অন্তরালে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে কালোবাজারি চোরাচালানকারীদের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে বস্ত্র সংকট সৃষ্টি করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

'স্বাধীনতা ডিনার' এই গল্পটির মধ্যেও স্বাধীনতা পরবর্তীকালের দেশের সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পীড়িত লেখকমনের প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।দীর্ঘকাল ব্যাপী ইংরেজ শাসন ও শোষণে জর্জরিত ভারতবাসীকে পরাধীনতার গ্লানি ও অপমান থেকে মুক্ত করতে জীবনপণ করেছিলেন সেকালের স্বাধীনতা সংগ্রামী তরুণেরা। ইংরেজ শাসনের কবল থেকে মুক্ত করে এক নতুন দেশ ও সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তারা সেখানে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে আসবে স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনেতাদের চক্রান্তে তাদের সেই আশা পূরণ হয়নি। স্বাধীনতার যে রূপ তারা প্রত্যক্ষ করে সেই স্বাধীনতা তারা চায়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামী গঙ্গাধরের চোখ দিয়ে বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করেন লেখক। স্বাধীনতা প্রাপ্তির

এক বছর পর সেই স্বাধীনতা লাভের উৎসব উদ্যাপনে মেতে ওঠে দেশ যা দেখে গঙ্গাধর তার অতীতের স্মৃতিচারণায় মগ্ন হন। তারা যখন যুবক তখন এই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তারাও স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন করেছিলেন তাদের সেই দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন যা ছিল তাদের সাধনা, তা আজকের যুবকদের কাছে সিদ্ধিতে পরিণত হয় ।কিন্তু সিদ্ধি আজ হাতের মুঠোর মধ্যে এলেও এই সিদ্ধির জন্য তাদের মৃত্যুপণ সাধনা ছিলনা ।কেননা দেশমাতার হৃদয়কে খন্ড-বিখন্ড করে এসেছে এই স্বাধীনতা, দেশভাগ স্বাধীনতার অভিশাপ হয়ে গেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় ছিন্নমূল হয়ে পড়েছে।ঘর-বাড়ি, আত্মীয়-পরিজন হারিয়ে তারা উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে। তাদের জীবনে নেমে এসেছে অশেষ দুর্গতি ও দুর্ভোগ । সরকারের পক্ষ থেকে এই সমস্ত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য সেরকম কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। তাদের প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে কোনোরকম সহমর্মিতা প্রকাশ পায়নি, সেইসঙ্গে মন্ত্রী রাজনৈতিক নেতাদের চক্রান্তে খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি দেখা যায়,ভেজাল জিনিসে বাজার ছেয়ে যায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সামাজিক জীবনের এই চিত্র দেখে গঙ্গাধর গভীরভাবে মর্মাহত হয়। যে স্বাধীনতা লাভের জন্য তারা জীবনের সবটুকু ত্যাগ করেছিলেন,সেই স্বাধীনতার এরকম বীভৎস অমানবিক রূপ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয় গঙ্গাধর -"এইজন্যই কি ছিল তাহাদের সেই মৃত্যুপণ সাধনা? -অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ নাই, তাহাও যে অভাবে নাই এমন নয়, থাকিতেও নাই, অর্থপিশাচদের লালসা দিনদিনই বাড়িয়া মানুষকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করিতেছে। প্রতিকার নাই ,কে করিবে? যাহাদের হাতে শাসন তাহাদের টিকি ওই পিশাচদের মুঠোর মধ্যে, মাঝে মাঝে এক একটি ফাঁকা হুংকারে ঠাট বজায় রাখে—তাহাতে প্রজারা হয় ক্ষণিকের জন্য আশ্বস্ত, ওদিকে পিশাচেরা হাসে কেননা ওটা ওদের উভয়ের মধ্যে একটা চুপি চুপি বন্দোবস্ত।'[৩] তাই যুবকেরা যখন রাস্তা দিয়ে 'ভারত মা কি জয়', এই স্লোগান দিতে থাকে তখন তা গঙ্গাধরের কাছে বিদ্রুপের মতো শোনাতে থাকে। দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠায় চোখ পড়লেইদেখতে পাওয়া যায় সমাজের বর্তমান পরিস্থিতির নিষ্ঠুর চিত্র "পাকিস্তানিরা ভালোভাবেই ঢুকিয়া পড়িয়াছে কাশ্মীরে বড় ক্যালিবারের কামান লইয়া— রাজাকারেরা পণ করিয়াছে আর হিন্দু বলিয়া কিছু থাকিতে দিবে না— দুইটা সংবাদ খোঁজা একটা যেন বাতিকে দাঁড়াইয়া গেছে গঙ্গাধরের। একটা অনেকদিন আগের পুরনো খবরের জের— মন্ত্রীর দল হানা দিয়া কোন মাড়োয়ারির ময়দার কলে তেঁতুলের বিচির পাহাড় আবিষ্কার করে, কি হইল তারপর ? দ্বিতীয় খবর বাঙ্গালীদের নাকি পল্টন তোলা হইবে, অপেক্ষাকৃত অধুনাতন খবর, আবার চাপা পড়িয়া গেছে। দুটোতেই বড় আশা জাগাইয়াছিল—রোজ একবার এ-কোন থেকে ও-কোন পর্যন্ত খুঁজিয়া যান— প্রায় পাগলামি। একখানি চিঠি-"...সম্পাদক মহাদয়েষু উলিপাড়া গোবিন্দপুরের হাটে চালের অবস্থা দিন দিনই শঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছে, গত সপ্তাহের অপেক্ষা এ সপ্তাহে মন পিছু তিন টাকা বর্ধিত হইয়া এখন সাড়ে তেইশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, আরোও আশঙ্কার বিষয় যে, কাঁকরের অনুপাত দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। "[৪]এই সমস্ত জীবন্ত সমস্যা দেশে প্রতিনিয়তই বেড়ে চলছিল।

দেশের সামাজিক মানুষের ওপর ঘনিয়ে আসা এই সমস্ত জীবন্ত সমস্যার দিকে কোনরকম দৃষ্টি ছিল না। এই সমস্যা মেটানোর দিকে কোনোরকম তৎপরতা সরকারের পক্ষ থেকে দেখা যায়নি, বরং তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতেই মেতে উঠেছিল। স্বাধীনতার বর্ষপূর্তিতে দেশের সমাজের সাধারণ মানুষের কথা বিন্দুমাত্র না ভেবে নিজেরা চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় সহযোগে স্বাধীনতা ডিনারে মেতে উঠেছিল। ন্যূনতম বিবেকের দংশন, শোভনতা, শালীনতা লজ্জাবোধ বিসর্জন দিয়ে প্রচন্ড দুর্মূল্যের বাজারে ভালো ঘি, ময়দা,

পুকুরের মাছ, গুণধর পাঁঠার ফরমাস করে পাঠায়। এবং ইংরেজি কায়দায় গালভরা নাম দেয় 'স্বাধীনতা ডিনার'। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা গঙ্গাধরের পুত্র অমরেশ পর্যন্ত এই ভোজে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক জেনে ব্যথিত হয় সে। এই ভোজের সমস্ত আয়োজনের দায়িত্ব এসে পৌঁছায় গঙ্গাধরের সুহৃদ পতিতপাবনের উপর। তারই দালান বাড়িতে এই ভোজের আয়োজন হয়। গঙ্গাধর তার আয়োজন করতে গিয়ে রাষ্ট্রনেতাদের উপর ক্রোধে সেই দুর্মূল্য বাজারে ভালো ভোজের পরিবর্তে এমন আয়োজন করে যাতে সেই খাবার কারোও মুখে দেওয়ার যোগ্য থাকে না।

এইভাবে তৎকালীন সময়পর্বে জনসাধারণের কল্যাণকর কাজে সরকারের উদাসীনতা এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনতার প্রতি লেখকের মনের তীব্র বিক্ষোভ 'স্বাধীনতা-ডিনার' গল্পটির মধ্যে রূপ লাভ করেছে।

আবার 'বিরুর প্রশ্ন' গল্পেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার হাত ধরে আসা মহামন্বন্তরে সমগ্র দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন লেখক। গল্পটির কথকের বন্ধু হিসাবে চিত্রিত হয়েছে বিরু চরিত্রটি যার চোখে ধরা পড়েছে মন্বন্তরের করুণ চিত্র। অসংখ্য নিরন্ন মানুষের হাহাকারের চিত্র। দু মুঠো অন্নের জন্য কলকাতার রাজপথে ভিড় করে আসে মানুষ। গ্রাম থেকে দলে দলে তারা কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। মানুষের দরজায় দরজায় অন্নের জন্য বিফল পার্থনা করতে থাকে তারা। ভাত নয়, একটু ফ্যান পেলেও তারা বেঁচে যায়। লেখকের ভাষায় — "প্রত্যেক বাড়ির দোরগোড়ায় দুটি তিনটি ,দুটি তিনটি করে দাঁড়িয়ে দু বছরের থেকে সত্তর বছরের পর্যন্ত কারুর কোলে ছয় মাসের শিশু— দেখলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে —হাতে এক একটা করে মাটির বাসন— বড়জোর একটি লোহার শানকি –মুখে এক বুলি - 'মা একটু ফেন দাও মা'।"[৫]এসব মানুষের জন্য বিরু সবকিছু বিলিয়ে দেয়। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ করে শহরের অধিকাংশ মানুষের মন থেকে মনুষত্ব বোধটুকু হারিয়ে গেছে । তারা নিজেদের স্বার্থপরতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত নিরন্ন মানুষগুলির ক্রন্দন তাদের মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারেনি। তাই বিরু বলেছে 'কেউ বেঁচে নেই' শহরে অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষের মন থেকে বিবেকবোধ, মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে গেছে। বিরু কিন্তু এই স্বার্থপর মানুষগুলির সাথে একাসনে বসতে পারেনি। সে এই অসংখ্য অভুক্ত আশ্রয়হীন অবাঞ্ছিত মানুষদের সাথে এক দলে মিলে গেছে "তাহার চারিদিকে দশ বারোটি কঙ্কালসার জীব-- মানুষ বলা চলে না তাদের, কেহ ভিক্ষা চাহিতেছে, কেহ নির্জীব ভাবে পড়িয়া, কেহ হাতের পাত্র থেকে কাড়িয়া ভক্ষণ করতেছে। দু একটি শিশু আমসির মতো স্তন হইতে সান্তনা আহরণের চেষ্টা করিতেছে, মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে বিরু"[৬] কিন্তু সত্যি তো এই মানুষগুলি উচ্ছিষ্ট পেয়ে বেঁচে থাকার যোগ্য নয়। দেশের তথাকথিত শিক্ষিত বিবেকবান মানুষগুলির মধ্যে শুভবোধ জাগ্রত হোক, বীরুর অবস্থার মধ্য দিয়ে লেখক সেই প্রার্থনায় করেছেন।

এভাবে মন্বন্তরকালীন বাংলার সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র 'বিরুর প্রশ্ন' গল্পটির মধ্যে ফুটে উঠেছে।

ভারতবর্ষকে দ্বিখন্ডিত করে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে আসে। হিন্দুস্তান আর পাকিস্তান দুটি দেশের জন্ম হয়। এবার এই দুটি দেশের জন্ম কে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়, যে দাঙ্গায় উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য নিরীহ মানুষের প্রাণ যায়। 'কলকাতা নোয়াখালী বিহার' গল্পগ্রন্থের 'বিশ্বাস' গল্পটির কথা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়।

গল্পের মুখ্য দুটি চরিত্র পরেশ এবং রহমান তারা দুজনে দীর্ঘকাল জুড়ে পরস্পর পাশাপাশি বাস করে আসছিল। কলকাতার একটি পল্লীতে তারা ছিল একে অপরের প্রতিবেশী । শুধু প্রতিবেশী নয় তাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তা ছিল সোনার মতোই খাঁটি। তারা দুজনে ভিন্ন সম্প্রদায়ের হলেও সেই সম্প্রদায় গত কোনো বিভেদ তাদের মধ্যে ছিল না। হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র বসতি ছিল সেখানে। দাঙ্গা কালীন পরিস্থিতিতেও তাদের সম্পর্কের মধ্যে প্রথমদিকে কোন চিড় ধরেনি। শিশুকাল থেকেই রহমান ও পরেশ ছিল বন্ধু, একই স্কুল একই ক্লাসে তাদের যাত্রা শুরু হয়। তখন হিন্দুস্তান ও আর পাকিস্তান এর মধ্যে কোনো ভেদ তৈরি হয়নি। স্কুল পেরিয়ে কলেজ,চাকরির জীবন সবই তাদের একসাথে, এমনকি বিবাহ তাদের একই সাথে হয়। পরেশ ও রহমান দুজনেই দুজনের বাড়ির সকলের মন জয় করে নেয়। পরেশের বাড়ির লোকজন যেমন রহমানের বাড়ি অবাধে যাতায়াত করে তেমনি রহমানের বাড়ির লোকজনও পরেশের বাড়ি যাওয়া-আসা করত। এরকমই আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধনে জড়িত ছিল উভয়ের পারিবারিক ব্যক্তিগত জীবন।

কিন্তু একসময় সম্প্রদায়গত বিভেদ দেশজুড়ে তীব্র আকার লাভ করে। যুদ্ধবিগ্রহ, হানাহানি কাটাকাটি নিত্য সংঘঠিত হতে থাকল। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান দেশমাতাকে খন্ডিত করার নেশায় মেতে উঠল গোটা দেশ। দেশ-মাতৃকার সন্তানেরাই দেশের অঙ্গচ্ছেদ করার খরগ কে নিজের হাতে তুলে নেয়। তার ফলে – 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ার ভেদনীতি হইল আরো সফল। আগে ছিল "মন্দির ভাঙ্গো" "মসজিদ ভাঙ্গো" রব তাহার চেয়ে "দেশ ভাঙ্গো" রবটা আরোও মিষ্ঠ লাগিল –একতরফা রব, কিন্তু সংঘর্ষে আটকাচ্ছিল না, অখন্ড ভারতীয়রাও তো রহিয়াছে ওদিকে, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই। এত বিরাট একটা গন্ডগোল যে তাহার মধ্যে বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ্য দুর্ভিক্ষ মূর্মুষুর হাহাকারও চাপা পড়িয়া গেল—তাহারা হিন্দুও ছিল মুসলমানও ছিল।"[৭] এইরকম পরিস্থিতিতে বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয়ই পরস্পরের বিরুদ্ধে হানাহানি হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে। দেশচ্ছেদ বিশ্বাসীদের দল হঠাৎই জেহাদ ঘোষণা করে বসে। এই রাজনৈতিক উত্তেজনায় মেতে ওঠে রহমানও।দাঙ্গাকারী মানুষগুলির সঙ্গে সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। হিন্দুদের দেশ ছেড়ে ,এলাকা ছেড়ে তাড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করতে থাকে। চারিদিকের পরিবেশ পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তাল, যেকোনো মুহূর্তে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ নেমে আসতে পারে। এই কথা ভিতরে ভিতরে আন্দাজ করতে পেরে রহমান একসময় পরেশ কে এলাকা ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়, কিন্তু পরেশ এত সহজে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে পারেনি। দীর্ঘদিন ধরে আত্মীয়ভাবে বসবাস করা মানুষগুলো যে ভয়ানক শত্রু হয়ে উঠতে পারে সে কথা সে কল্পনাতেও আনতে পারেনি। এমনকি তার প্রাণপ্রিয় বন্ধু রহমান যে সম্প্রদায়িক হত্যা লীলায় মেতে, নিজের শৈশবের বন্ধুর কোনো ক্ষতি করতে পারে একথা সে কল্পনাতেও আনতে পারেনি ।তাই রহমান পরামর্শ দিলেও পরেশ সেই এলাকা ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় না। সে রহমানকে বলে --"কিন্তু জিন্না সাহেবের এদিক কার সেন্টিমেন্ট টা দেখছিস তো?...স্পষ্টই তো বলছে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন অভিসন্ধি নেই,এখানকার মন্ত্রীদেরও তো ওই একই সুর ,সেরকম উগ্র নেই তো আর ,কাগজগুলো পড়ছিস না? দিন যতই এগিয়ে আসছে, নিজেদের দায়িত্ব--জ্ঞান নিশ্চয়ই ফিরে আসছে; বুঝছে তো —যা বলে ফেলছে তাতেই খানিকটা মিসচিফ হয়ে পড়বে।"[৮] কিন্তু তা সত্ত্বেও রহমান পরেশকে তার ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে বলে। পরেশ সে কথায় আমল দেয় না তার মাসুল গুনতে হয় তাকে, জেহাদের দিন পরেশের সমস্ত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তার বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে যায়। রহমানও এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুক্তি পায় না। মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের মারে তেমনি হিন্দুরাও

উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তারও পুরো পরিবার বিনষ্ট হয়ে যায়। শুধু তার ত্রিশ বছরের বন্ধু পরেশ রহমানের একমাত্র মেয়ে নুড়িকে বাঁচিয়ে রাখে।

সেইসময় পর্বে এই বিপুল ধ্বংসযজ্ঞে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কবলে পড়ে শুধু পরেশ বা রহমানই নয় তাদের মতো অনেক মানুষ, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাদের পরিবার আত্মীয় পরিজন সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেছিল। শুধু পরেশ ও রহমানের মতো যারা বেঁচে ছিল তাদের স্বজন হারানোর বেদনার পাশাপাশি বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা ও অনুতাপ নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছিল স্বাধীনতার পূর্বে দেশভাগকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের এই পাশবিকতার পরিচয় কে লেখক 'বিশ্বাস' গল্পটির মধ্যে অত্যন্ত জীবন্ত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিভূতিভূষণের গল্পে এই রাজনৈতিক উত্তেজনায় সমাজের বাস্তব রূপ যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি সমাজের অভ্যন্তরে মানুষের মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা, তারও পরিচয় রয়েছে বিভিন্ন গল্পে। যেমন 'সম্পত্তি' গল্পে দুজন জমিদারের মধ্যে মূঢ় প্রতিদ্বন্দিতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'জাগ্রত' গল্পে হরকালির চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেবতার প্রতি অন্য বিশ্বাসের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। 'প্রতিপত্তি' গল্পেও দেখা যায় দেশের নারী সমাজ দেবতার নামে বিমূঢ় বিস্ময়ে বিবশ, অন্ধ সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন। আবার সমাজে অস্পৃশ্যতা,জাতিভেদও যে কতখানি প্রখর তারও পরিচয় রয়েছে 'দেবতা' গল্পটির মধ্যে। এ প্রসঙ্গে আমরা 'দেবতা' গল্পটির একটু বিস্তারিত আলোচনা করব।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলন অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সাধারণ মানুষের কাছে গান্ধীজী এক দেবতা স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীজীর মতাদর্শে নিম্নবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর মানুষেরা নানা আন্দোলনে মেতে উঠেছিল, এতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল মালিক শ্রেণীকে 'দেবতা' গল্পে রমণী চাটুজ্যে এরকমই একজন চোরা চালানকারী ব্যবসাদার, যিনি শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের কাছে নিজের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর জন্য গান্ধীমন্দির বানানোর পরিকল্পনা করেন। তাকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে নবীন হাজরা, সংকর পাল, কেষ্ট মজুমদার, সারদা বিশ্বাসের মতো মানুষেরা। যারা প্রত্যেকেই চোরা ব্যবসায়ের সঙ্গে ছিল যুক্ত। কারো ছিল চুন সুরখির কারবার, কারোও বা সিমেন্টের চোরা গুদাম আছে ইত্যাদি। বেশ আড়ম্বর সহকারে, ধুমধাম করে তারা অনেক পরিকল্পনা করে গান্ধীজীর মন্দির বানানোর সংকল্প করে—'একদিকে থাকিবে চরখা- তাঁতশালা, একদিকে ছাগলঘর – ভোগের পায়েসের ব্যবস্থার জন্য। খুব একটা বড়ো যজ্ঞ করিয়া গান্ধীজীর মূর্তি স্থাপনা হইবে।"[৯]

গল্পে চোরাব্যবসায়ের একটি মস্ত বড় প্রতিবন্ধক চরিত্র হিসেবে দেখা যায় বিনোদকে। তার নেতৃত্বে চোরাব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কুলি-মজুরেরা নানা বিদ্রোহে মেতে ওঠে। এই গান্ধী মন্দির নির্মাণের কথায় প্রথমে সে প্রচন্ড ক্রোধান্বিত হয়। তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকতে তাদের মন্দির নির্মাণ না করে এমনকি গ্রামে যে বড় শিব মন্দির আছে , সংস্কারের অভাবে যার ভগ্নদশা সেই মন্দির কে মেরামত না করে একজন মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে মন্দির বানানোর উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে, রমনী চাটুজ্জের বাড়ি গিয়ে যথেষ্ট রাগ দেখায় । কিন্তু চোরাব্যবসায়ীদের সকলেই এই কাজের জন্য প্রশংসা করতে থাকে রমণী চাটুজ্জেকে। গান্ধীজীর মতো মহাপুরুষের মন্দির নির্মাণ করে তিনি খুবই পুণ্য কাজ করছেন বলে তারা মনে করেন। কিন্তু পরে বিনোদ এই কাজের আসল উদ্দেশ্যকে ভালোভাবে বুঝতে পারে। আসলে

এটা ছিল চাটুজ্জের একটা প্রকান্ড চাল। এর মধ্যে আসলে ভক্তি কোথাও ছিল না। কারণ –"কুলি-মজুরগুলো ক্রমাগতই বেহাত হইয়া যাইতেছে, কথায় কথায় ধর্মঘট, শহরে পাঁচটা কল, তার মধ্যে তিনটে ওর নিজের, একরকম অকর্মণ্যই হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে, গান্ধী মন্দির প্রতিষ্ঠা কড়িয়া বুড়ো রমণী চাটুজ্যে এই কটাকে চাই ঠেকাইয়া রাখিতে। কতদূর সম্ভব সে আলাদা কথা, কিন্তু চেষ্টা করিতেছে।"[১০] তাই বিনোদ যদি এই কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তো কুলি মজুরদের কাছে তার জনপ্রিয়তা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সেই কারণে বুদ্ধি খাটিয়ে এক অভিনব পরিকল্পনা গ্রহন করে।

সাতাশে আষাঢ় একটা যজ্ঞ করে মহাশক্তির পুজো করে মন্দিরের বুনেদ দেওয়ার দিন স্থির হয়। সেইদিন সর্বত্র চাটুজ্যে মহাশয়ের জয়-জয়কার পড়ে যায়। খদ্দর পড়ে তিনি সর্বত্র তদারকি করে বেড়াতে থাকেন অত্যন্ত বিনয় সহকারে। বিকাল পর্যন্ত যজ্ঞ সমাপন শেষে মন্দিরের বুনেদ দেওয়ার সময় হঠাৎই সদলবলে বিনোদ এসে উপস্থিত হয়। সঙ্গে আনে হান্ডা, চাঙ্গারি,আর একটি পিঠে পা ওলা ধর্ম গাইয়ের মতো একটি রহস্যজনক ছাগল। এসব আয়োজনের কৈফিয়ৎ দিয়ে বলে যে, গান্ধীজীর কাছে নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁর সত্যিকারের প্রসাদ নিয়ে এসেছে যা সবার মুখে সে তুলে দিতে চায়। তাই "এখানে এসে এই দু হাঁড়ি পায়েস করে তার সঙ্গে তার সেই মুখের প্রসাদ মিশিয়ে দিয়ে সমস্তটাকে পবিত্র করে নিয়েছি। এইবার আপনারা সেই প্রসাদ পেয়ে ধন্য হবেন।"[১১] এই প্রসাদ সবার আগে প্রাপ্য পুরোহিত নিবারণ ভট্টাচার্যের। তাকে প্রসাদ দিতে গেলেই ভক্তির মোড়ক উন্মোচিত হয়ে যায় সবার সামনে। অত্যন্ত রাগে কম্পিত হতে হতে চিৎকার করে বলে ওঠে – ' কী! আমি পঞ্চানন সার্বভৌমের সন্তান, আমায় বেনের প্রসাদ খেতে হবে? এতবড় স্পর্ধার কথা বলে আমায় অর্বাচীন।"[১২] বিনোদ এর প্রত্যুত্তরে বলে— "দেবতার জাত নেই বলেই আমি জানতাম, তাই এই সাহসটা করেছিলাম।"[১৩] তাই যিনি দেবতাকে সবথেকে ভালো চিনে এই মহান কাজের উদ্যোগ করেছেন সেই রমণী চাটুজ্যের নিকট প্রসাদ নিবেদন করলে তিনি রাগে আক্রোশে কাঁপতে কাঁপতে বলেন – "আর আমার পূর্বপুরুষেরা বুঝি চামার ছিল মশাই? ঐ পেসাদ মুখে দিতে হবে আমায়! লোকে পঞ্চানন সার্বভৌমের নাম শুনেছে আর বাসুদেব বাচস্পতির নাম শোনেনি? আমি এই উনসত্তর জাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঐ বেনের মুখের উচ্ছিষ্ট...।"[১৪] এরপর সকলের নিকট সমস্ত বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়। আসলে এইসব হল বুজরুকি, ধাপ্পাবাজি। জনতা ক্ষেপে ওঠে, ঐ প্রসাদ তাদের মাথায় ঢেলে দিতে চায়।

এই গল্পে একদিকে যেমন অসৎ ব্যবসায়ী শ্রেণীর মানুষের ধর্মের নামে মিথ্যাকে আশ্রয় নেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তেমনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা যে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসেও তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মানুষের কাছে কতটা প্রবলভাবে বিরাজিত ছিল তারও অত্যন্ত বাস্তব পরিচয় 'দেবতা' গল্পের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

এইভাবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর লেখা ছোটোগল্পের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজনৈতিক আন্দোলন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার বাস্তব প্রতিচ্ছবির সাথে সমাজের অভ্যন্তরের বিভিন্ন ক্ষত কে তাঁর ছোটোগল্পের মধ্যে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে রূপায়িত করেছেন। সেই সময় এর বিশ্বাসযোগ্য সামাজিক দলিল হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর লেখা ছোটোগল্প গুলির গুরুত্বকে তাই অস্বীকার করা যায় না।

তথ্যসূত্র:

১) দত্ত সরোজ 'বিভূতিভূষন মুখোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য - সাধনা': রত্নাবলী, ৫৯ এ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৯; জানুয়ারি১৯৮৫/পৌষ ১৩৯১, পৃ-৩৭

২)মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ -রচনাবলী; ষষ্ঠ খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, চৈত্র ১৪১৬, লঘুপাক' দুঃশাসন, গল্প,পৃ-৩২১

৩) ঐ, স্বাধীনতা ডিনার, পৃ-৩২২

৪) ঐ, পৃ-৩২৩

৫) বীরুর প্রশ্ন , ঐ, পৃ-৩১৩

৬) বীরুর প্রশ্ন , ঐ, পৃ-৩১৫

৭) মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ -রচনাবলী; ৪ র্থ খন্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, আশ্বিন ১৪১৮, 'কলিকাতা নোয়াখালি- বিহার','বিশ্বাস' পৃ-২৭৫

৮) ঐ, পৃ-২৭৬

৯) মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, কথাচিত্র; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স , আশ্বিন ১৩৫৬, দেবতা, পৃ-১৪

১০) ঐ, পৃ-১৯

১১) ঐ, পৃ-২৩

১২) ঐ, পৃ-২৫

১৩) ঐ, পৃ-২৫

১৪) ঐ, পৃ-২৬

আকর গ্রন্থ:

১) মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ রচনবলী, চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ , আশ্বিন ১৪১৮.

২) মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩,১৪১৬

৩) মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'কথাচিত্র',মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩,আশ্বিন ১৩৫৬

সহায়ক গ্রন্থ:

১) গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ন 'সাহিত্যে ছোটোগল্প', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩,২০১৬

২) গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ন 'বাংলা গল্প বিচিত্রা', প্রকাশভবন, ১৫বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩,মাঘ ১৪০১.

৩) ঘোষ মঞ্জুরি সম্পাদনা, 'অপ্রবাসী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯,১৯৮৯

৪) দত্ত সরোজ, 'বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য' সাধনা, রত্নাবলী, ৫৯ বেচতে চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৯.১৯৮৫/পৌষ ১৩৯১

৫) মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার 'কালের পুত্তলিকা—বাংলা ছোটোগল্পের একশ বিশ বছর /১৮৯১-২০১০', সুধাংশু শেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, সেপ্টেম্বর ২০১১

৬) মুখোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ, 'জীবন-তীর্থ', নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭০আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৪,১লা ফাল্গুন ১৩৬৬.